দৈনিক ইত্তেফাক

31

তারিখ ... APR 11 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ডঃ মোঃ মোশাররফ হোসাইন মিঞা

(গত সংখ্যার পর)

৪.১.২ ভৌত সুবিধাদি ঃ

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। অথচ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক ভৌত সুবিধাদিসমূহ বিদ্যমান নেই। কৃষি শিক্ষাকে আরো আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত ভৌত সুবিধাদি থাকা প্রয়োজন ঃ

● যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজে উপস্থাপনা ও বুঝানোর জন্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত শ্রাব্য-দর্শন সহায়কের ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

● প্রতিটি ল্যাবরেটরিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসহ সকল ধরনের গবেষণা সুবিধা থাকা প্রয়োজন এবং দিনরাত ল্যাবরেটরীতে কাজ করার সুবিধা ও ব্যবস্থা থাকা দরকার। একজন গবেষকের সর্বশেষ গবেষণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি সকল ধরনের অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সুবিধা থাকা প্রয়োজন। ● লাইব্রেরীতে সর্বশেষ প্রকাশিত বই, জার্নাল অথবা অন্যান্য প্রকাশনার সরবরাহ নিশ্চিত করা উচিত। ● বিশ্ব মানসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করতে হবে যাতে ব্যয়বহুল, স্পর্শকাতর এবং অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি (যেমন- ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপ, মাস স্পেকটোমেট্রি ইত্যাদি) থাকবে। ● শিক্ষা ও গবেষণা খাতের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট বাজেট থাকতে হবে। ● প্রত্যেকটি গবেষণাগারে পর্যাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

৪.১.৩ শিক্ষার গুণগতমান ঃ

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য চাই গুণগত-মানসম্পন্ন শিক্ষক। সে জন্য সেরা মেধাবী ছাত্রটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হবে। তাঁদের জন্য উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

৪.১.৪ পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯% শিক্ষার্থীর মতে এই পরীক্ষা মোটেই উপযুক্ত নয়, ৩৮%-এর মতে উপযুক্ত নয়, ৩১%-এর মতে মোটামুটি উপযুক্ত এবং ৯% ও ৩%-এর মত হলো যথাক্রমে উপযুক্ত এবং খুবই উপযুক্ত। এই গবেষণা থেকে বুঝা যায় অধিকাংশ ছাত্র এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে সঠিক মনে করে না। তাই একবিংশ শতাব্দীর পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়া উচিত নিম্নরূপ ঃ

● ৫০% নম্বর থাকবে রচনামূলক প্রশ্নের জন্য এবং ৫০% নম্বর থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নের জন্য। ● অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নের পরীক্ষা মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষেই হয়ে যাবে। এতে লেখাপড়ার সাথে সাথে ছাত্ররা ক্লাসের প্রতি মনোযোগী হবে। ● বিভিন্ন শ্রেণী/বিভাগের পরিবর্তে ফলাফল বিভিন্ন গ্রেডের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

৪.২ গবেষণা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হচ্ছে গবেষণা। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে নতুন নতুন জ্ঞানের। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান সৃষ্টি ও পরিচর্যার স্থান। গবেষণালব্ধ ফলাফল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অধিকতর আলোকিত করবে-এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজ পরিবর্তন করবে, সমাজকে আধুনিকায়ন করবে যা দেখা যায় আমেরিকান ও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উপর নোবেলপ্রাপ্তরা অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এ থেকে বুঝা যায় নতুন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করা, নতুনভাবে চিন্তা করতে প্রেরণা দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয় যদি তরুণ মনে নতুন নতুন বিষয়গুলো ওপর গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন কিছু করার আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারে, তবে সে বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকার অর্থে উদ্দেশ্যহীন। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কোন বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ মেধার সমাহার যেমন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেধাসমূহের সমাহার। এই মেধাকে যদি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত করা যায় তবে নতুন কিছু পাওয়া যাবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমাদের এখানে গবেষণার সুযোগ খুবই সীমিত। তারপরও এই সীমিত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়েই আমাদের গবেষণা করতে হবে। নচেৎ একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে অগ্রযাত্রা হবে তাতে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর যে scientific jargon ব্যবহার করা হবে সেগুলো বোঝার লোকও আমাদের থাকবে না। তাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের-

● বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার একটা মাষ্টার প্ল্যান থাকবে। তাতে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা থাকবে। এই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ডিগ্রীভিত্তিক এবং প্রকল্পভিত্তিক গবেষণা করতে হবে। ইচ্ছা-মাফিক এলোমেলো গবেষণা চলতে দেয়া সঠিক হবে না।

● বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রির্চাস সিস্টেম (বাউরেস)-কে আরো শক্তিশালী করতে হবে, গবেষণা বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

● বাউরেসের একটি আলাদা বরাদ্দ থাকতে হবে যাতে মাঠে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গবেষণার অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব হয়।

● তাৎক্ষণিকভাবে গবেষণা উপকরণ ও রাসায়নিক উপকরণ ক্রয় করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা বাজেট থাকতে হবে।

● যে সকল শিক্ষক গবেষণায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তাঁদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

● এমএস বা পিএইচডি পর্যায়ের গবেষক ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে।

● শিক্ষক-গবেষকদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আরো অধিক পরিচিত করার জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিক হারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে যোগদানের সুযোগ করে দিতে হবে।

● বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে কম্পিউটারসহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে আরো আধুনিকায়ন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে স্বল্প পরিসরে এ কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর অধীনে আলাদা শাখা করে বৃহৎ পরিসরে অথবা স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র" নামে আলাদা একটি সেল খোলা যেতে পারে।

৪.৩ সম্প্রসারণ ঃ

যে-কোন প্রযুক্তি যত মূল্যবানই হোক না কেন এর যদি ব্যবহার না হয় তবে তা মূল্যহীন। তাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের নিকট পৌছানো এবং কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করানোর জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক)কে আরো শক্তিশালী করতে হবে। বাউএক-কে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ঃ

● বর্তমানে বাউএক-এর কার্যক্রম চলছে ময়মনসিংহ সদর থানার ২২টি গ্রামে। এই কার্যক্রমকে যদি বর্ধিত করে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় ২/১টি গ্রামে চালু করা যায় তা খুবই ফলপ্রসূ হবে।

● একবিংশ শতাব্দীতে সরকার বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে যাচ্ছে। বাউএক-কেও সেই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করতে হবে। ফলে প্রতিটি থানার কৃষি সেক্টরের যেমন কৃষি, মৎস্য, পশুপালনের কি সমস্যা, কি হাল অবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যাবে এবং সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকরা উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে কার্যকর গবেষণা প্রকল্প হাতে নিতে পারবেন।

● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গণসচেতনতাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান ও প্রবন্ধ প্রচার এবং প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অপরিচিত ও প্রশিক্ষণবিহীন। কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের এই গুরুদায়িত্ব বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সম্প্রসারণ সংগঠনগুলো হাতে নিলেও বাউএক যে সকল গ্রামে তাদের কার্যক্রম হাতে নিবে সেখানকার কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিবে।

৫. উপসংহার ঃ

সরকার ঘোষিত ২০০২ সাল নাগাদ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা অর্থাৎ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা দক্ষ কৃষিবিদদের। কাজেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহেলা করলে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বর্তমান ধারাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও গবেষণা উপকরণাদির। সমাবেশ ঘটাতে হবে সেরা মেধার। বিশ্বমানের জ্ঞান সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করতে হবে বিশ্বমানের সুবিধাদি। এজন্য বাজেট বাড়াতে হবে বাস্তবতার নিরিখে এখানে কার্পণ্য করলে চলবে না। আর তাই প্রয়োজন জাতীয় সদিচ্ছা যার প্রকাশ ঘটে জাতীয় রাজনীতিবিদ ও সরকারের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে প্রথিতযশা কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথানের উক্তিটি মনে পড়ে- "বিজ্ঞান কেবলমাত্র পথ দেখাতে পারে ও প্রযুক্তি দিতে পারে। কিন্তু ক্ষুধা দূরীকরণের যাদু বিজ্ঞানীদের হাতে নেই; বরং তা রয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে, যাঁরা লক্ষ্য ও প্রাধান্য নির্ধারণ করে থাকেন। যাঁরা বিজ্ঞানের পরিচালনা করেন এবং সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা যদি সদিচ্ছা ও একাগ্রতার সাথে একত্রে কাজ করতেন, তাহলে কোন মানুষকেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিছানায় যেতে হতো না।"

মোদ্দাকথা হ'ল, সরকারকে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আন্তরিক হতে হবে এবং সকল খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর জন্য বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একমাত্র কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ নরমেন আরনেষ্ট বরলগের নিম্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ ঃ

"I believe, if proper emphasis is given to agriculture and if sound financial policies are established and implemented, that the line can be held on the food production front during the time of the next doubling of the world population. If this is to be achieved, it will riquire far fewer words and sensationalized reports and much more research action and production."

এটি নিতান্তই অপরিহার্য যে, জাতীয় নেতৃত্ব ও সরকার আমরা সবাই একবিংশ শতাব্দীর ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ যথার্থ উপলব্ধি করি এবং এর জন্য যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এজন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৃষি উন্নয়নের জাতীয় কর্মকান্ডে কৃষিবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়াও প্রয়োজন। (সমাপ্ত) ❑

সরকার ঘোষিত ২০০২ সাল নাগাদ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা অর্থাৎ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা দক্ষ কৃষিবিদদের। কাজেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহেলা করলে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বর্তমান ধারাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও গবেষণা উপকরণাদির। সমাবেশ ঘটাতে হবে সেরা মেধার। বিশ্বমানের জ্ঞান সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করতে হবে বিশ্বমানের সুবিধাদি। এজন্য বাজেট বাড়াতে হবে বাস্তবতার নিরিখে এখানে কার্পণ্য করলে চলবে না।